INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD)
© 2026 IJNRD | Volume 11, Issue 4, April 2026 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG

“ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে বাঙালি বিপ্লবীদের হাতে তৈরি বোমা ও তার ব্যবহার”

পার্থ কর্মকার

সহকারী শিক্ষক

সাবলসিংহপুর হাই মাদ্রাসা (উঃ মাঃ)

সাবলসিংহপুর, হুগলী

সংক্ষিপ্তসারঃ

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার একদল বিপ্লবী তরুণ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করা এবং জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগিয়ে তোলা। এই আন্দোলনে বোমা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র, যা অনেক ক্ষেত্রেই বিপ্লবীদের নিজেদের হাতেই গোপনে তৈরি করা হতো। বিভিন্ন গোপন বিপ্লবী সংগঠন, যেমন অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের সদস্যরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বোমা নির্মাণের কৌশল আয়ত্ত করেন এবং তা ব্যবহার করে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের ওপর আক্রমণ চালান। আলিপুর বোমা মামলা, মুজাফ্‌ফরপুর বোমা নিক্ষেপ প্রভৃতি ঘটনা এই সশস্ত্র আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। যদিও এই ধরনের কর্মকাণ্ড বিতর্কিত ছিল, তবুও তা ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে।

শব্দ সূচকঃ স্বাধীনতা সংগ্রাম, ইতিহাস, কংগ্রেসি ভিক্ষাবৃত্তি, পুলিশি অত্যাচার, গুপ্ত সমিতি, বোমা নির্মাণ ও নিক্ষেপ, মানসিক শক্তি

ইংরেজদের প্রায় ২০০ বছরের নিপীড়ন অত্যাচার সহ্য করে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। দিল্লির লালকেল্লায় স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলিত হয়। জওহরলাল নেহেরু এক আবেগদীপ্ত ভাষণে বললেন, "At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake of life and freedom."[১] কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের এই পথটি মোটেই সহজ বা মসৃণ ছিলো না । বহু বীর শহীদের রক্তের বিনিময়ে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর 'স্বাধীনতার মুখ' গ্রন্থে বলেছেন, "স্বাধীন ভারত এসেছিল রক্ত পিচ্ছিল পথে...।"[২]

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল প্রধানত দুটি স্বতন্ত্র ধারায় - প্রথমটি পরিচালিত হয়েছিল নিয়মতান্ত্রিক পথে অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, প্রতিরোধ, বিক্ষোভ, পিকেটিং, মিছিল ও গান্ধীজীর অহিংস

সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে; এবং দ্বিতীয়টি পরিচালিত হয়েছে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বলাবাহুল্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দ্বিতীয় ধারাটি যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি কৌতূহলপ্রদ। বলতে দ্বিধা নেই বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন গ্রন্থে বা প্রচার মাধ্যমে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এই দ্বিতীয় ধারাটিকে বিকৃতভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবীদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়েছেন।[৩] তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রশাসনের চোখে হয়তো তাঁরা সন্ত্রাসবাদী। বস্তুতপক্ষে 'সন্ত্রাসবাদ' কথাটির মধ্যে যে হীন অর্থ দেখা যায়, বিপ্লবীদের সম্পর্কে তা প্রয়োগ করা যুক্তিহীন। তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য ছিল সর্বস্ব পণ এবং দরকার হলে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে দেশমাতার মুক্তি। তাঁরা কোন স্বার্থ অথবা পদের জন্য এই আত্মোৎস্বর্গ করেননি। তাঁরা আবেদন-নিবেদন নীতি, বয়কট, স্বদেশীমূলক চরম পন্থার নিষ্ফলতা উপলব্ধি করে বিকল্প পথ হিসেবে সশস্ত্র সংগ্রামের রাস্তা বেছে নেন। তাই এইসব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কর্মপদ্ধতিকে 'Terrorism' বা 'সন্ত্রাসবাদ' না বলে 'Revolutionary Movement' বা 'বিপ্লবী আন্দোলন' বলাই সঙ্গত। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী তাই 'সন্ত্রাসবাদ' অভিধাটি গ্রহণ না করে তিনি 'বৈপ্লবিক কর্মধারা' কথাটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছেন।[৪] রাওলাট রিপোর্টেও 'বৈপ্লবিক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[৫]

মহারাষ্ট্রে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও এর পরিপূর্ণতা ঘটেছিল বাংলায়। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সূত্র ধরে বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের আঁতুরঘর ছিল বিভিন্ন গুপ্ত সমিতিগুলি। ইউরোপের ইয়ং ইতালি, কার্বোনারি, ওয়েলফি, এ্যাডেলফি, ফেডারিটি, হেটাইরিয়া ফিলিকে প্রভৃতি গুপ্ত সমিতিগুলির অনুকরণে বিংশ শতকের গোড়া থেকেই বাংলায় একাধিক গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। এইসব গুপ্ত সমিতির সদস্যরা প্রকাশ্যে ব্যায়াম, শরীরচর্চা, লাঠি খেলা, ছোরা চালনা, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা, তরবারি খেলা প্রভৃতি অনুশীলন করলেও গোপনে বাংলার যুবসমাজকে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য প্রস্তুত করাই ছিল এইসব গুপ্ত সমিতিগুলির মূল লক্ষ্য। বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিপ্লবী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ইংরেজদের শোষণ ও অত্যাচার এবং কংগ্রেসের মধ্যপন্থীদের 'ভিক্ষাবৃত্তি' নিশ্চিতই বাংলার যুবসমাজকে ক্ষুব্ধ করে; অন্যদিকে জনগণকে সদর্থক ভাবে নেতৃত্ব দিতে চরমপন্থী নেতাদের ব্যর্থতাও তাঁদের 'বোমার রাজনীতি'-র দিকে ঠেলে দেয়।[৬]

বাংলায় বিপ্লবী কার্যকলাপ সংঘটনে প্রাচীনতম সংগঠন হলো অনুশীলন সমিতি, যার প্রতিষ্ঠা ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে (বা ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ) ।[৭] যদিও অন্য একটি মতে কলকাতার আত্মোন্নতি সমিতি গুপ্ত সমিতিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম ছিল।[৮] ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি. মিত্র) ছিলেন অনুশীলন সমিতির প্রথম সভাপতি; সহ-সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং অরবিন্দ ঘোষ।[৯] এই অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করতো ছাত্র ভান্ডার, আত্মোন্নতি সমিতি, চন্দননগর গোষ্ঠী সহ পূর্ববঙ্গ তথা ঢাকার নানান সমিতি। আবার মূল অনুশীলন সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়েও 'যুগান্তর' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শ্রী অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে গড়ে তোলেন যুগান্তর গোষ্ঠী।[১০] প্রথমদিকে এই সমিতিগুলি রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত ছিল না। কিন্তু ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর থেকেই বাংলার বিভিন্ন গুপ্ত সমিতিগুলি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। অধ্যাপক সুমিত সরকার মনে করেন যে, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা না হলে বাংলার বিভিন্ন সমিতিগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর সঞ্জীবনী সভার মতো স্থিমিত হয়ে পড়তো। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। যেমন, ময়মনসিংহের 'সাধনা সমিতি' ও 'সুহৃদ সমিতি'; ফরিদপুরের 'ব্রতী সমিতি'; ঢাকার 'মুক্তি সংঘ' ও 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'

প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে ঢাকা অনুশীলন সমিতি নিয়মানুবর্তিতা ও সাংগঠনিক শক্তির দিক দিয়ে খুবই শক্তিশালী ছিল এবং এর নেতা ছিলেন পুলিনবিহারী দাস। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য গুপ্ত সমিতি স্থাপনের চেষ্টা না হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহা কার্যতঃ বিশেষ ফলদায়ী হয় নাই। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে সমস্ত বাংলাদেশ লর্ড কার্জনকৃত অপমানে যে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগর বক্ষের মতো চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল সেই চাঞ্চল্য হইতে প্রকৃতপক্ষে বাংলায় বিপ্লববাদের উৎপত্তি।[১১]

বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গুপ্ত সমিতিগুলির কার্যকর্তারা বিভিন্ন রকমের কার্যকলাপ গ্রহণ করতেন। এগুলির মধ্যে অন্যতম হলো বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে অত্যাচারী ইংরেজদের মনে ভীতির সঞ্চার করা ও তাঁদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করা। আলোচনার সুবিধার্থে এখন কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা এবং সেই সঙ্গে কয়েকটি বোমা মামলার উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই পর্বে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাগুলি ছিল যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি কৌতূহলপ্রদ।

ভারতে স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী আন্দোলনে প্রথম বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটি পূর্ববঙ্গে ঘটেছিল। পূর্ববঙ্গের তদানীন্তন অত্যাচারী লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার'কে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়। যদিও এই হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।[১২] ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলনে ব্রিটিশ পুলিশের জঘন্য অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে ফুলার'কে হত্যার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে এ কাজ সম্পন্ন করতে দায়িত্ব নেন বারীন্দ্র কুমার ঘোষ এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।[১৩] ফুলার সাহেবের উপর নিক্ষেপিত বোমাটি নির্মাণ করেছিলেন বিপ্লবী বিভূতি চক্রবর্তী।[১৪]

পরবর্তী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর মেদিনীপুরের নারায়ণগড় রেল স্টেশনের কাছে।[১৫] আক্রমণের লক্ষ্যে ছিলেন বাংলার ছোটলাট স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার। রেল লাইনের নিচে বোমা রাখা হয়েছিল। ফ্রেজার সাহেবের স্পেশাল ট্রেন ওই পথে উড়িষ্যা থেকে কলকাতায় আসছিল।[১৬] বোমাটি বিস্ফোরণ ঘটালেও সাফল্য আসে নি। ফ্রেজার সাহেব প্রাণে বেঁচে যান, তবে ট্রেনের ইঞ্জিনের প্রচন্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ফ্রেজার সাহেবকে হত্যার দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি নেওয়া হয় ঐ বছরেরই শরৎকালে। এই সময় ফ্রেজার সাহেব দার্জিলিঙে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। সেখানে তাঁর ওপর বোমা ছোঁড়বার পরিকল্পনা করেন বিপ্লবী চারুচন্দ্র দত্ত। পরিকল্পনামতো কলকাতা থেকে বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীকে ডেকে আনা হয়। ঠিক হয় সাহেব যেদিন গির্জায় যাবেন সেই দিন তাঁর ওপর বোমা ছোঁড়া হবে।[১৭] নিছিদ্র পুলিশি নিরাপত্তার কারণে সেদিন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হওয়ায় বিপ্লবীরা ফ্রেজার সাহেব বধের তৃতীয় পরিকল্পনা করেন। দার্জিলিঙে একদিন ক্রিকেট খেলা দেখতে যাবার কথা ছিল ফ্রেজার সাহেবের। ঠিক হয় যে ওখানেই বোমা বিস্ফোরণে সাহেবকে হত্যা করা হবে। সেই মতো প্রফুল্ল চাকী বোমা নিয়ে ক্রিকেট মাঠে অপেক্ষা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সাহেব ঐ দিন ক্রিকেট খেলা দেখতে যাননি।[১৮] দার্জিলিঙে ছুটি কাটিয়ে ১ নভেম্বর ফেজার কলকাতায় ফেরেন। কিছুদিন পর তিনি বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এই সময় বাংলার বিপ্লবীরা সাহেবকে হত্যার চতুর্থ পরিকল্পনাটি করেন। দায়িত্ব নেন বারীন্দ্র কুমার ঘোষের নেতৃত্বে একদল তরুণ বিপ্লবীরা। ঠিক হয় সাহেবের যাত্রাপথে মানকুন্ডু রেল স্টেশনের কাছে রেললাইনে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। কিন্তু নির্জন স্থান দেখে রেললাইনে মাইন প্রতিস্থাপনের আগেই ফ্রেজার সাহেবের ট্রেন এসে পড়ে।[১৯] ফলে বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু এসবের পরেও বিপ্লবীরা

হাল ছাড়েন নি। এর ঠিক দশ দিন পর সাহেব যখন ঐ পথেই কলকাতায় ফিরবেন তখন মানকুন্ডু রেল স্টেশনের কাছে রেলব্রিজে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে বলে পঞ্চম পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু সব ব্যবস্থা পাকা হলেও সেদিন সাহেবের ট্রেন ওই পথে আসেনি।[২০]

এরপরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে বিহারের মজঃফরপুরে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল রাত আটটা তিরিশ মিনিটে। এই ঘটনাটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরিকল্পনা করা হয় অত্যাচারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড'কে হত্যার। ব্রিটিশ সরকার এই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে কিংসফোর্ড'কে বিহারের মজঃফরপুরে বদলি করে দেন। কিন্তু বারীন্দ্র কুমার ঘোষের নির্দেশে ভারতমায়ের বীর সন্তান বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড'কে হত্যা করতে মজঃফরপুরে যান। তাঁরা ভুলক্রমে কিংসফোর্ড মনে করে মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যার গাড়িতে বোমা ছোঁড়েন। ফলে দুই নিরাপরাধ মহিলার মৃত্যু হয়। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে প্রফুল্ল চাকী আত্মাহুতি দেন এবং ক্ষুদিরাম বসু ধরা পড়েন। পরে বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। এই বোমা বিস্ফোরণের সূত্র ধরে ব্রিটিশ পুলিশ কলকাতার মানিকতলার মুরারিপুকুরের বাগানবাড়ি তল্লাশি করে বহু বিস্ফোরক পদার্থ, বোমা, কার্তুজ ইত্যাদি উদ্ধার করেন। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস কানুনগো সহ ৩৪ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে শুরু হয় 'আলিপুর বোমা মামলা' বা 'মুরারিপুকুর বোমা মামলা' বা 'মানিকতলা বোমা মামলা' (১৯০৮ খ্রিঃ)। মজঃফরপুরের আগেও কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। একবার একটি বইয়ের ভিতর বিস্ফোরকপুরে কিংসফোর্ড'কে তাঁর কলকাতার বাসভবনে পাঠানো হয়। এমন ব্যবস্থা করা হয় যে, বইটি খুললেই বিস্ফোরণ ঘটবে। এই অসাধারণ শৈলীতে প্রস্তুত বই-বোমাটি নির্মাণ করেছিলেন বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস কানুনগো[২১] এবং ডাকপিওনের ছদ্মবেশে বইটি কিংসফোর্ড'কে গার্ডেনরিচের বাসভবনে গিয়ে দিয়ে এসেছিলেন বিপ্লবী পরেশ মৌলিক।[২২] নানান কাজে ব্যস্ত থাকায় কিংসফোর্ড ঐ বই-বোমাটি খোলেননি। সবার অলক্ষে বইটি অন্যান্য বইয়ের স্তূপে চাপা পড়ে থাকে। ইতিমধ্যে কিংসফোর্ড বদলি হয়ে বিহারের মজঃফরপুরে চলে যান।

এরপর বাংলার বিপ্লবীরা গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা ডেনহ্যাম'কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু এখানেও তাঁরা সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারে ডেনহ্যাম সাহেব ভেবে শ্রী কাউলে নামে জনৈক ইওরোপিয়ানের উপর বোমা ছোঁড়েন চুঁচুড়ার ষোল বছরের কিশোর ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়। কিন্তু বোমাটি মাটিতে পড়ার পরও বিস্ফোরিত হয়নি। ফলে কেউ হতাহত হয়নি। কাউলের ওপর নিক্ষেপিত বোমাটি ছিল সুরেশ চন্দ্র দত্ত পরিকল্পিত এবং চন্দননগর কেন্দ্রে নির্মিত।[২৩] এই ঘটনায় ননীগোপাল ধরা পড়েন, বিচারে তাঁর বারো বছরের জেল হয় এবং তাঁকে আন্দামানে পাঠানো হয়।[২৪]

এরপরের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটি 'Capital Conspiracy Case 1912' বা 'লর্ড হার্ডিঞ্জ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত। ঘটনাটি হল, ইতিমধ্যে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড অধিপতি পঞ্চম জর্জ ভারতে এসে কলকাতা থেকে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই অবস্থায় ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লিতে জাঁকজমকপূর্ণ এক দরবারের আয়োজন করেন ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর। ঐ দিন যখন সস্ত্রীক লর্ড হার্ডিঞ্জ হাতির পিঠে চড়ে ভারতের নতুন রাজধানী দিল্লিতে প্রবেশ করছিলেন, তখন তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়েন নদীয়া জেলার ভূমিপুত্র বসন্ত বিশ্বাস।[২৫] এই বিস্ফোরণের ঘটনায় লর্ড হার্ডিঞ্জ মারাত্মক আহত হলেও

প্রাণে বেঁচে যান, মৃত্যু হয় তাঁদের মাহুতের। এই বোমা বিস্ফোরণের মূল নায়ক ছিলেন অধুনা পূর্ব বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামের বীর সন্তান বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, যিনি পরবর্তীকালে ভারত ত্যাগ করে জাপানে যান এবং সেখানে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আইএনএ তৈরি করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু'র স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনেকটা সহজ করে দেন।

দিল্লিতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পাঁচ মাস কেটে যাবার পর বিস্ফোরণ ঘটে লাহোরে। এবার সিলেটের প্রাক্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অত্যাচারী গর্ডন'কে হত্যার পরিকল্পনা করেন বিপ্লবীরা। পরিকল্পনা অনুযায়ী লাহোরের লরেন্স গার্ডেনে একটি তাজা বোমা রেখে আসেন রাসবিহারী বসুর বিশ্বস্ত সহকর্মী, তরুণ বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস। কিন্তু গর্ডন সাহেব সেদিন ঐ পথে আসেননি। একজন নিরীহ চাপরাশি ঐ পথে যাচ্ছিলেন সাইকেল চালিয়ে। বিস্ফোরনে মৃত্যু হয় তাঁর।[২৬] অত্যাচারী গর্ডন'কে এর আগেও হত্যার চেষ্টা করেছিলেন বিপ্লবীরা। এই কাজের জন্য অনুশীলন সমিতির কয়েকজন সদস্য সহ যোগেন চক্রবর্তী'কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু গর্ডন'কে হত্যা করার জন্য নির্ধারিত বোমাটি যোগেনের হাতে ফেটে যায় এবং তিনি মারা যান।[২৭]

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলকাতার রাজাবাজারে একটি বোমা তৈরীর গোপন ডেরায় ব্রিটিশ পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে মারাত্মক বিস্ফোরক দ্রব্য পিকরিক অ্যাসিড দ্বারা তৈরি বোমা উদ্ধার করে। এই ঘটনার সূত্র ধরে গ্রেপ্তার করা হয় অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বস্থানীয় বিপ্লবী অমৃতলাল হাজরা ওরফে শশাঙ্ক এবং আরো দুজন ব্যক্তি- দীননাথ ও সুলতান চাঁদ। শুরু হয় 'রাজাবাজার বোমা মামলা ১৯১৩।[২৮]

ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের নজর এড়িয়ে একাধিক জায়গায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ব্রিটিশ প্রশাসনকে যথেষ্ট বিচলিত করে। তাই পুলিশ সন্দেহজনক কোন কিছু বুঝলেই খানাতল্লাশি ও ধরপাকড় শুরু করে। এমনই ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মানিকতলার ওয়ার্ড ইনস্টিটিউট স্ট্রিটে যশোদারঞ্জন পালের বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে একটি ট্রিগার ধরনের বোমা উদ্ধার করে। এই ঘটনায় যশোদারঞ্জন পাল, অবনী চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, ও সন্তোষ মিত্র'কে গ্রেফতার করে মামলা রুজু করা হয়। এই মামলাটি 'দ্বিতীয় মানিকতলা বোমা মামলা' বা 'দ্বিতীয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত।[২৯] যাই হোক মানিকতলায় প্রাপ্ত এই ট্রিগার ধরনের বোমাটি ছিল বিপ্লবী গণেশ ঘোষের তৈরি।[৩০]

ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী কার্যকলাপ দমনের উদ্দেশ্যে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে। এর দ্বারা ব্রিটিশ পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে যেকোনো বাড়ি তল্লাশি এবং বিনা বিচারে যেকোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা লাভ করে। এই আইন বলে বাংলার বুকে নিষ্ঠুর দমন নীতি নেমে আসে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ নভেম্বর দক্ষিণেশ্বর এবং তার পরেই শোভাবাজার স্ট্রিটের একটি বাড়িতে হানা দিয়ে ব্রিটিশ পুলিশ ভয়ংকর ধরনের দুটি বোমার কারখানা আবিষ্কার করে। এই ঘটনার সূত্র ধরে পুলিশ 'দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা' রুজু করে। গ্রেপ্তার করা হয় অনন্তহরি মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, হরিনারায়ণ চন্দ প্রমুখ বিপ্লবীদের।[৩১]

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ যখন রাজনৈতিক অস্থিরতায় কম্পমান ঠিক এমন সময় ঐ বছরেরই ৮ এপ্রিল দিল্লির কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলো। ঐদিন বিধান পরিষদের অধিবেশনে 'শিল্প বিরোধ বিল' (Trade Disputes Bill) ও 'জননিরাপত্তা বিল' (Public Safety Bill) নামে দুটি প্রতিক্রিয়াশীল ও জনস্বার্থ বিরোধী বিল নিয়ে আলোচনা চলছিল। প্রথম বিলটির উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক শ্রেণির ধর্মঘটের অধিকার খর্ব করা এবং দ্বিতীয় বিলটির উদ্দেশ্য ছিল ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন দমন করা। স্পিকারের চেয়ারে বসেছিলেন বিঠলভাই প্যাটেল। বিল দুটি ভোটাধিকারে পরাস্ত হলে বড়লাট তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেগুলিকে বৈধ বলে ঘোষণা করতে উদ্যোত হলে বিলটির বিরোধিতা করে ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত দর্শকের গ্যালারি থেকে আইন সভার মেঝেতে তিনটি বোমা নিক্ষেপ করেন। বোমাগুলি এমন ভাবে ছোঁড়া হয়েছিল যাতে কারো প্রাণহানি না হয়। এরপর তাঁরা সভাকক্ষে রেড-প্যামফ্লেট ছড়িয়ে দেন এবং ঘোষণা করেন যে, কাউকে হত্যা করা নয় - 'বধিরকে শোনানোর জন্য প্রচন্ড কন্ঠস্বরের প্রয়োজন' - তাই বোমা ফাটানো হয়েছে।[৩২] বোমা নিক্ষেপ করেই ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত হাতের আগ্নেয়াস্ত্র ফেলে দেন। নিরস্ত্র দুই বীর বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এই ঘটনায় সারাদেশ তোলপাড় হয়ে ওঠে। মজার বিষয় এই যে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের ছোঁড়া বোমাগুলি ছিল বাঙালি বিপ্লবী যতীন দাসের তৈরি।[৩৩]

বোমা বিস্ফোরণ ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম হলো ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ডালহৌসী স্কোয়ারে বোমা বিস্ফোরণ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনায় ব্যাপক পুলিশি ধরপাকড় শুরু হয় এবং বিপ্লবীরা প্রায় সকলেই ধরা পড়েন। এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে বিপ্লবীরা তৎকালীন কলকাতা পুলিশের কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট'কে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনামতো ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ আগস্ট কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারে টেগার্টের গাড়ি লক্ষ্য করে প্রথম বোমা ছোঁড়েন দীনেশচন্দ্র মজুমদার। বোমার আঘাতে টেগার্টের গাড়ি ভয়ংকর ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সাহেব প্রাণে বেঁচে যান। এই সময় উল্টো দিক থেকে বোমা ছোঁড়েন অনুজাচরণ সেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বোমাটি তাঁর কাছে ফেটে যাওয়ায় বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় অনুজাচরণ সেনের দেহ।[৩৪] পরে দীনেশচন্দ্র মজুমদার ধরা পড়েন, বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।[৩৫] টেগার্টের ওপর নিক্ষেপিত এই বোমাগুলি ছিল অ্যালুমিনিয়াম খোলের অতিশক্তিশালী টিএনটি বোমা, যা প্রস্তুত হয়েছিল ডাঃ নারায়ণ রায়ের উদ্যোগে।[৩৬]

বিংশ শতকের প্রথমদিকে অর্থাৎ লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর বাংলায় চরমপন্থী বিপ্লবাদের সূচনা হলেও পরবর্তীকালে তার মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজরা বেকায়দায় পড়লে বাংলার বিপ্লবীরা তার সুযোগ নিয়ে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। তাই ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে বাংলায় বিপ্লবী রাজনীতির 'স্বর্ণযুগ' বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। বিপ্লব সংঘটনে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাগুলি ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বোমা বিস্ফোরণগুলি অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হলেও ইংরেজদের মনে তা যে প্রবল ভীতি ও উদ্বেগের সঞ্চার করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, এর ফলেই ইংরেজ সরকার একের পর এক কালা কানুন জারি করে বিপ্লববাদ দমনে সচেষ্ট হয়। যাইহোক বোমা নির্মাণে নিযুক্ত কয়েকজন বাঙালি অগ্নি পুরুষের কথা এখন আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বোমা নির্মাণের কথা আলোচনা করলে প্রথমেই যে বাঙালির নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়, তিনি হলেন নদীয়া জেলার বীর সন্তান বিপ্লবী বিভূতি চক্রবর্তী। বিএসসি পাস করা এই যুবকই

বাঘা যতীনের অনুরোধে প্রথম বোমা প্রস্তুত করেন।[৩৭] এই বোমাটি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ফুলার সাহেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়। বিভূতি চক্রবর্তী বোমা তৈরীর শিক্ষা গ্রহণ করেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন, বিভূতি চক্রবর্তী দ্বারা নির্মিত বোমাটি ভারতীয়দের দ্বারা প্রস্তুত প্রথম বোমা। অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইংরেজ বিতাড়ণের জন্য প্রথম বোমা নির্মাণের কৃতিত্ব একজন বাঙালিরই।[৩৮] এরপর সফল বোমা নির্মাতা হিসেবে যাঁর নাম পাওয়া যায় তিনি হলেন সেকালের এক তরুণ তুর্কি উল্লাসকর দত্ত।[৩৯] প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নের ছাত্র উল্লাসকর দত্তের পিতা দ্বিজদাস দত্ত ছিলেন শিবপুর বি ই কলেজে (পূর্বে নাম ছিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ) কৃষি বিজ্ঞানের অধ্যাপক।[৪০] পিতার অধ্যাপনার সুবাদে উল্লাসকর দত্ত বি ই কলেজের লাইব্রেরী এবং গবেষণাগার ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিলেন। গবেষণাগারে প্রাপ্ত নানান রাসায়নিক যৌগের সংমিশ্রণে বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক প্রস্তুতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন তিনি।[৪১] এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, উল্লাসকর দত্তের বোমা নির্মাণের জন্য বি ই কলেজের গবেষণাগার ব্যবহার সম্ভব হতো না যদি তাঁর স্বদেশ প্রেমিক পিতা দ্বিজদাস দত্তের পরোক্ষ সমর্থন না থাকতো। পরে ৩২ নং মুরারিপুকুর রোড, ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেন, ৩৮/৪ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট এবং গোয়াবাগানের বাড়ি ছিল উল্লাসকর দত্তের বোমা তৈরি এবং বিস্ফোরক পদার্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রধান কেন্দ্র।[৪২] পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর বাংলার ছোটোলাট স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার'কে হত্যার জন্য মেদিনীপুরের নারায়ণগড় রেলস্টেশনের কাছে যে বোমা বিস্ফোরণ হয় সেই বোমাটি (বোমাটি নির্মিত হয়েছিল পিকরিক অ্যাসিড এবং পটাশিয়াম ক্লোরেট) প্রস্তুত করেছিলেন উল্লাসকর দত্ত গোয়াবাগানের বাড়িতে।[৪৩] অন্যদিকে দুঁদে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের নজর এড়াতে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ কলকাতার বাইরে দেওঘরে বোমা নির্মাণের একটি গোপন কেন্দ্র স্থাপন করেন। যদিও এই গোপন কেন্দ্রে উল্লাসকর দত্তের ফর্মুলা অনুসারে নির্মিত বোমার প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণটি ছিল অত্যন্ত দুঃখের। কেননা, এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণে প্রফুল্ল চক্রবর্তী নামে একজন তরুণ বিপ্লবী শহীদ হন।[৪৪]

অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের অস্ত্রগুরু হিসেবে এরপর যাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন মেদিনীপুর জেলার ভূমিপুত্র বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস কানুনগো। বোমা তৈরীর আধুনিক পদ্ধতি শেখবার জন্য তিনি নিজের পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে আগস্টে ফ্রান্সের প্যারিসে গিয়েছিলেন।[৪৫] তিনি সেখানে নির্বাসনে থাকা জনৈক রুশ বিপ্লবীর কাছে বোমা তৈরীর ফর্মুলা শেখেন। এছাড়া তিনি বিস্ফোরক বিষয়ক তিনটি বই জোগাড় করেন - (১) Nitro Explosives, (২) Modern High Explosives, (৩) বিশিষ্ট ফরাসি বিজ্ঞানী মঃ বার্থোলো-র লেখা বই।[৪৬] তবে তিনি শুধু বিস্ফোরক তৈরী করাই শেখেননি, ইওরোপীয় ধারায় গুপ্ত সমিতি গঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং অনুশীলন সমিতির মুরারিপুকুরের বোমা তৈরীর গোপন কেন্দ্রে তিনি তিনটি বোমা তৈরী করেন। মুরারিপুকুরে তাঁর তৈরী তিনটি বোমার প্রথমটি ফরাসি চন্দননগরের মেয়রকে হত্যার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মেয়র অল্পের জন্য বেঁচে যান। দ্বিতীয়টি বইয়ের আকারের এবং তাতে স্প্রিং লাগানো ছিল। যথা সময়ে বই না খোলাতে কিংসফোর্ড সাহেব বেঁচে যান। তৃতীয় বোমাটি ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে ব্যবহার করেছিলেন।[৪৭] যাইহোক মারণ বোমা নির্মাণে হেমচন্দ্র দাস কানুনগো ছিলেন এদেশে একজন উপযুক্ত শিক্ষক। তাই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আলিপুর বোমা মামলার অন্যতম রূপকার হেমচন্দ্র দাস কানুনগো'কে "অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য" বলে অভিহিত করেছেন।[৪৮]

বিভূতি চক্রবর্তী, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস কানুনগো ছাড়াও বোমা নির্মাণে অভিজ্ঞ হিসেবে আর যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন গণেশ ঘোষ, যতীন দাস, সুরেশচন্দ্র দত্ত, ডাঃ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, মণীন্দ্রনাথ নায়েক, সতীশচন্দ্র দে, ডাঃ নারায়ণ রায়, হরিনারায়ণ চন্দ, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, অনন্ত সিংহ, তারকেশ্বর দস্তিদার প্রমুখ। তবে এই তালিকায় আরও দুজনের নাম সংযোজন না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তাঁরা হলেন বীরাঙ্গনা পারুল মুখার্জী এবং মাস্টারদা সূর্যসেনের আদর্শে অনুপ্রাণিত কল্পনা দত্ত (পরবর্তীতে কল্পনা যোশী)। পারুল মুখার্জী ছিলেন টিটাগর ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম।[৪৯] তিনি বোমা প্রস্তুতে বিপ্লবীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করতেন। অন্যদিকে বেথুন কলেজের কৃতি ছাত্রী কল্পনা দত্ত সুদূর চট্টগ্রামে নিজের বাড়িতে বসে গান কটন প্রস্তুত করতেন।[৫০]

বিস্ফোরক দ্রব্য থেকে বোমা তৈরি ও বোমা নিক্ষেপের প্রতিটি স্তরে বাঙালি বিপ্লবীরা যে দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যদিও অনেক ক্ষেত্রে বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের সময় কিংবা অভীষ্ট লক্ষ্যে বোমা ছোঁড়বার সময় অসাবধানতার জন্য বিপ্লবীরা দুর্ঘটনার মুখে পড়তেন। মৃত্যুও হয়েছে অনেকের। আমাদের আলোচনাতেই দেখেছি দেওঘরে বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের সময় শহীদ হন প্রফুল্ল চক্রবর্তী নামে এক তরুণ বিপ্লবী। যোগেন চক্রবর্তীও গর্ডনকে হত্যা করতে গিয়ে নিজের হাতেই বোমা ফেটে শহীদ হন। আবার চার্লস টেগার্ট'কে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ার সময় সেই বোমা তাঁর কাছেই ফেটে যাওয়ায় শহীদ হন অনুজাচরণ সেন। বিপ্লবীদের এই মৃত্যু নিঃসন্দেহে দুঃখের ও হতাশার। তবুও এরপরেও বলা যায় তাঁরা প্রাণ দিয়ে বাঙালি বিপ্লবীদের দ্বারা নির্মিত বোমার কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণ দিয়েছিলেন। একটা কথা ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে - 'বিস্ফোরক দ্রব্য জোগাড় করা, তা দিয়ে বোমা তৈরী, তৈরী বোমা বহন করে নিয়ে যাওয়া, সঠিক পদ্ধতিতে বোমা নিক্ষেপ করা, আবার ব্রিটিশ পুলিশের থেকে নিজেকে নিরাপদে রাখা। কেননা, ধরা পড়লে রাজদ্রোহিতার অপরাধে সর্বোচ্চ সাজা (ফাঁসি)' – বিপ্লবীরা এতসব সূক্ষ্ম ও জটিল কাজ করতেন কিভাবে!! এইসব কাজ সঠিকভাবে করার জন্য বিপ্লবীদের যথেষ্ট মানসিক শক্তির প্রয়োজন। তাই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, বিপ্লবীরা এত মানসিক শক্তি পেতেন কিভাবে? এর উত্তর পাওয়া যাবে বিভিন্ন গুপ্ত সমিতিগুলিতে পুলিশি খানাতল্লাশিতে প্রাপ্ত বস্তুগুলি পর্যবেক্ষণ করলে। বিভিন্ন বিস্ফোরক দ্রব্য, পিস্তল, কার্তুজ ও লিবলেটের সাথে পুলিশ মূলত যে তিনটি বইয়ের সন্ধান পেতেন তা হল – 'গীতা', বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত'।[৫১] এই বইগুলি বিপ্লবীরা পাঠ করতেন এবং এখান থেকেই তাঁরা তাঁদের মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটাতেন। পরাধীন ভারতে আমাদের দীনহীন জীবনে যিনি প্রথম মৃত্যুর গর্জন শুনিয়েছিলেন তিনি হলেন শহীদ ক্ষুদিরাম। ফাঁসির মঞ্চে ওঠার আগে ক্ষুদিরাম'কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'মৃত্যুকে তোমার ভয় করেনা?' তিনি অকম্পিত কণ্ঠে বলেন, 'না, আমি মরতে ভয় পাই না। আমি 'গীতা' পড়েছি।[৫২] বিশেষ করে গীতার কর্মযোগ পড়ে তরুণ বিপ্লবীরা উদ্‌বুদ্ধ হতো দেশকে স্বাধীন করার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে গীতাই বিপ্লবাদের বীজ বপন করেছিল। অন্যদিকে বিপ্লবাদের প্রসারে ও তার ভিতকে গ্রানাইট পাথরের ন্যায় শক্ত করার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের লেখা 'কর্মযোগ' ও 'বর্তমান ভারত' পাঠ করে তরুণ বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য জীবনকে বাজি রেখে স্বাধীনতার পবিত্র অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। স্বামীজি নিজেও বিপ্লবী ছিলেন। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কামান প্রস্তুতকারক স্যার হিরমন ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন এবং সমগ্র ভারত পদব্রজে ঘুরে দেশীয় রাজাদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন।[৫৩] ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ও যুগান্তর দলের সদস্য হরিকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, - "বিপ্লব আন্দোলনে

স্বামীজীর প্রভাব? উত্তরে একটা কথাই যথেষ্ট তাঁর প্রভাব ও প্রেরণা সর্বাধিক। তাঁর বাণীর উদ্দীপনা ছাড়া বিপ্লব আন্দোলন ঐভাবে হতো কিনা সন্দেহ।[৫৪]

তথ্যসুত্রঃ

১. Chandra, Bipan. 'History of Modern India', Orient BlackSwan, New Delhi, Reprinted 2016, P. 330.

২. ত্রিপাঠী, অমলেশ, 'স্বাধীনতার মুখ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ জুলাই ২০১৯, পৃ. ১৫।

৩. Sarkar, Sumit. 'Modern India', K.P Bagchi & Company, Calcutta, Second Edition 1995, P. 123.

৪. ত্রিপাঠী, অমলেশ, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫ ১৯৪৭)', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ পৌষ ১৪২৫, পৃ. ৭৬।

৫. ঐ-পৃ. ৭৬।

৬. চন্দ্র, বিপান এবং অন্যান্য, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭ - ১৯৪৭', কে.পি বাগচী এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, দ্বিতীয় অনুবাদ সংস্করণ ২০১৪, (অনুবাদ - সুনীল মুখোপাধ্যায়), পৃ. ১০৬।

৭. স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম: 'জীবিত' স্বাধীনতা -সংগ্রামীদের দৃষ্টিতে', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৬তম পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২৭, গ্রন্থে অমলেশ ত্রিপাঠী রচিত ভূমিকা, পৃ. ৩৯।

৮. Neogi, G. 'The first national revolutionary secret society of colonial Bengal: The Atmonnoti Samiti (1897-1902)', Proceeding of the Indian History Congress, 2002, Vol. 63, P. 596-603.

৯. Majumdar, R.C. 'History of the Freedom Movement in India, Vol. I, Firma K L Mukhopadhyay, Calcutta, 1971, P. 405.

১০. স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ - পূর্বোক্ত - পৃ. ৪০।

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'নির্বাসিতের আত্মকথা', রাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৪, (প্রথম প্রকাশ ১৯২১), পৃ. ৩-৪।

১২. Majumdar, R.C. 'History of the Freedom Movement in India', Vol. II, Firma K L M Pvt. Ltd., Calcutta, 1963, P. 258.

১৩. ভারত ও ভারতের বাইরে বৈপ্লবিক আন্দোলন

https://wbschool.in/revolutionary-movement-in-india-and-abroad/

১৪. ঘোষ, বিনয়জীবন, 'অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র', রাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৭, (প্রথম প্রকাশ ১৯৫২), পৃ. ৫৪।

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ - পূর্বোক্ত - পৃ. ১৮।

১৬. Heehs, Peter. 'The Bomb in Bengal: The Rise of Revolutionary Terrorism in India 1900-1910', Oxford University Press, New York, 1993, P. 121.

১৭. ঐ-পৃ. ১১৭-১২০।

১৮. ঐ-পৃ. ১১৭-১২০।

১৯. ঐ-পৃ. ১১৭-১২০।

২০. ঐ-পৃ. ১১৭-১২০।

২১. ঘোষ, বিনয়জীবন - পূর্বোক্ত - পৃ. ৬৮।

২২. কলকাতা পুলিশ মিউজিয়ামে (১১৩, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড, কলকাতা ৭০০০০৯) সংগৃহীত/ প্রদর্শিত তথ্য। উপকরণ অনুযায়ী।

২৩. চন্দ্র, নারায়ণ, 'অবিস্মরণীয়', প্রথম খন্ড, প্রকাশক: গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র, ১৯৬৪, পৃ. ১৬।

২৪. বসু, ড. নিতাই, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম', পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ১২৫।

২৫. কলকাতা পুলিশ মিউজিয়ামে (১১৩, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড, কলকাতা ৭০০০০৯) সংগৃহীত/ প্রদর্শিত তথ্য। উপকরণ অনুযায়ী।

২৬. বসু, ড. নিতাই - পূর্বোক্ত - পৃ. ১২৮।

২৭. ঐ-পৃ. ১২৮।

২৮. বাগচী, অমলেন্দু, 'অগ্নিযুগের আগ্নেয়াস্ত্র, অনুশীলন সমিত, কলকাতা, ১৩৬৭ (ইং ১৯৭৪), পৃ. ১৯।

২৯. ঐ-পৃ. ১৯।

৩০. ঐ- পৃ. ৪৯।

৩১. ঘোষ, রাজর্ষি, 'ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার বোমা ও বাঙালি বিজ্ঞানীরা', খোয়াবনামা প্রান্তজনের কথা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪২৮, পৃ. ৫৩।

৩২. বসু, ড. নিতাই - পূর্বোক্ত - পৃ. ১৬৫।

৩৩. বাগচী, অমলেন্দু - পূর্বক্ত-পৃ. ৫৩।

৩৪. বসু, ড. নিতাই- পূর্বক্ত - পৃ. ১৭৭, ১৮১।

৩৫. ঐ-পৃ. ১৭৭, ১৮১।

৩৬. বাগচী, অমলেন্দু - পূর্বক্ত-পৃ. ৫৮।

৩৭. মুখোপাধ্যায়, পৃথ্বীন্দ্রনাথ, 'সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৩৬৭ (১৯৬০), পৃ. ১০৩।

৩৮. দত্ত, ড. ভূপেন্দ্রনাথ, 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম', নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১৫১।

৩৯. Majumdar, R.C. 'History of the Freedom Movement in India', Vol. II, Firma K LM Private Limited, Calcutta, 1963, P. 258.

৪০. Datta, Ullaskar. 'Twelve Years of Prison Life', The Arya Publishing House, Calcutta, 1924, P. 5.

৪১. দত্ত, উল্লাসকর, 'আমার কারা-জীবনী', সিংহ প্রেস, কুমিল্লা, প্রথম সংস্করণ (গ্রন্থ প্রকাশকাল অনুল্লিখিত), পৃ. ৪।

৪২. বাগচী, অমলেন্দু - পূর্বোক্ত- পৃ. ১২।

৪৩. ঐ-পৃ. ২০-২১।

৪৪. Majumdar, R.C. 'History of the Freedom Movement in India', Vol. II, Firma K L M Private Limited, Calcutta, 1963, P. 258.

৪৫. ঐ- পৃ. ২৫৮।

৪৬. কানুনগো, হেমচন্দ্র, 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা', কমলা বুক ডিপো লিমিটেড, কলকাতা, ১৯২৮, পৃ. ১৯৬।

৪৭. হেমচন্দ্র কানুনগো - https://g.co/kgs/xrcMYw

৪৮. জাতীয় পতাকার প্রথম রূপকার হেমচন্দ্র কানুনগো আজও উপেক্ষিত ইতিহাসে - https://www.amaderbharat.com/hemchandra-kanungo-the-first-designer-of-the-na tional-flag-i...

৪৯. চৌধুরী, চিন্ময়, 'স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী নারী', দেজ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ এপ্রিল

২০১৩, পৃ. ২৬, ২৮।

৫০. ঘোষ, রাজর্ষি - পূর্বোক্ত - পৃ. ৪১।

৫১. স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ - পূর্বোক্ত - পৃ. ২৯।

৫২. কর, শিশির, 'বিপ্লব আন্দোলনের নেপথ্যে নানা কাহিনী', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ৫৪।

৫৩. ঐ-পৃ. ২৪।

৫৪. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, (সম্পাদিত), 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ', রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, দ্বাদশতম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৯২৩।

Copyright & License:

© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.